মাতৃপ্রসঙ্গ

# প্রসাদং কুরু মে দেবি

তারাপদ ভট্টাচার্য

শরতের শিশিরসিক্ত বাতাসে যে-সুর ভাসিয়া বেড়ায় তাহাকে যদি অ-আ-ক-খ-তে বাঁধা হয় তবে অনিবার্যভাবে সেই অক্ষরপঙ্‌ক্তি হইবে : 'জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে'—হে মহিষাসুরদলনী রূপসী শিবগেহিনী পর্বততনয়া, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক।

পাঠক বলিবেন—এ তো ভাবের কথা হইল। খ্রিস্টানেরও এ, বি, সি আছে, তাঁহারা তো এমন দেখেন না। তাঁহাদের মস্ত বড়ো কবি শেলী লিখিলেন—'Autumn : a dirge'—শরৎ, একটি অন্ত্যেষ্টির সংগীত। সেখানে 'Bleak wind is wailing'—হিমেল বাতাস বিলাপ করিতেছে, 'bare boughs are sighing'—নগ্ন শাখা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে এবং 'the pale flowers are dying'—বিবর্ণ ফুলগুলি শুকাইয়া যাইতেছে। শরতে বছরটি 'dead cold'—মরিয়াছে, একেবারে ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে।

এই বিলাতি শরৎ আমাদের শরৎ একেবারেই নয়। আমাদের শরতে আমাদের মনের সৌন্দর্যবোধ বাহির হইয়া শরত-আলোর কমলবনে বিহার করে। শেফালির শাখায় বিহগ-বিহগী গান গায়। ধানের খেতে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা চলে। মধুর বাতাস হৃদয় উদাস করে। ঘরে মন টিঁকে না। প্রভাতের কিনারায় শুকতারা আঁখি মেলিয়া চায়।

আমাদের শরতে 'The warm sun is failing' নয়। আলোর অমল কমলখানি প্রস্ফুটিত হইয়া নীল আকাশের ঘুম ছুটাইয়া দেয়। কালিদাসের লেখনীতে 'প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা'—নতুন বউয়ের মতো রূপে রমণীয় শরৎ আসিয়াছে।

Keats অবশ্য তাঁহার 'Ode to Autumn' কবিতায় 'Season of mists and mellow fruitfulness'—বলিয়া শরতকে অনেক উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন কিন্তু সেখানেও 'mists' অর্থাৎ ঘন কুয়াশার কথা থাকায় শরত-আলোর ঝরনাধারা প্রবাহিত হয় না।

প্রাসঙ্গিক কথাটা হইল এই যে, ঠান্ডা হোক আর না হোক পশ্চিমের শারদ বাতাসে তো তাঁহারা 'কপর্দিনী'র নাম-গন্ধও পান না।

পান না তাহার কারণ 'ভাবো হি ভবকারণম্'—মনের ভাবই সৃষ্টির হেতু। উপনিষদ বলিয়াছেন : 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ'—সৃষ্টির পূর্বে অনাদি পরমেশ্বর ব্রহ্ম একমাত্র ছিলেন। 'সোঽকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি'—তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, প্রজা সৃষ্টি করিব। 'স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বম্ অসৃজত'—তিনি ধ্যান করিলেন। তিনি ধ্যান করিয়া এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন। বস্তুত চিন্তাই সৃষ্টির মূল।

'রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ'—রাবণের বধ এবং রামের প্রতি কৃপার বশে ব্রহ্মা এই শরতে দেবীর বোধন করিয়াছিলেন, সেইটা আমাদের অন্তরে স্থায়ী

ভাব হইয়া বছরে বছরে যখন অমল ধবল পালে মন্দমধুর হাওয়া লাগে ঠিক সেইসময়ে হাজির হইয়া বলে : 'রম্যকপর্দিনী' অর্থাৎ সুন্দরী শিবগেহিনী আসিতেছেন, তোমরা তাঁহার জয়ধ্বনি করো।

আশ্চর্য দেবীর মহিমা! সবে তো কলম ধরিয়াছি। ফুল নাই, ফল নাই, ধূপ নাই, দীপ নাই, মন্ত্র বলি নাই, প্রণাম করি নাই, শুধু ভাবিয়াছি—আজ তাঁহার আগমনী লিখিতে হইবে—সঙ্গে সঙ্গে কলম বর্ণের পর বর্ণ সাজাইয়া দিল।

'শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে,' তুমি শরণাগত, দীন এবং আর্তদের পরিত্রাণ কর—এই বলিয়া পূজারি মাথা নোয়ান তাঁহার পায়ে। শরণ নিতে পারি নাই মা, শুধু স্মরণ করিতেছি—এই বলিয়া যে আজ এই নির্মেঘ আকাশের তলে মৃদুমন্দ বাতাসের ছোঁয়ায় দেহ দিয়া দশপ্রহরণধারিণীর চরণে আবেদন করিব—''অয়ি জননী, মণ্ডপে মণ্ডপে, গৃহে গৃহে, ছোটো হোক বড়ো হোক যেখানে যে তোমার প্রতিমা বসাইবে, সেইখানে তাহার আবেদনে তুমি আসিয়ো।''

দেবী 'সর্বার্থসাধিকা'—সব অর্থ দান করেন। 'অর্থ' হইল বিষয়। এই বিষয়ের নামান্তর 'চতুবর্গ'—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। 'মোক্ষ' হইল মুক্তি—জন্মান্তরের অবসান।

আমাদের ঋষিকুল ধ্যানের মাধ্যমে মানুষের জীবনের পূর্ণতার জন্য তাহার বিভিন্ন প্রয়োজনের দিকে নেত্রপাত করিয়া সরস্বতীর কাছে বিদ্যা, লক্ষ্মীর কাছে বিত্ত, এমন নানা বিষয়ের অধিপতি নানা দেবতার কাছে নানা বিষয়ের আর্জি জানাইয়াছেন বিভিন্ন মন্ত্রে। কিন্তু পরিপূর্ণতার প্রতি তাঁহাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা মহিষাসুরের তাণ্ডবপীড়িত সমস্ত দেববৃন্দের ললাটনিঃসৃত তেজোরাশির সমন্বয়ে গঠিত নারীমূর্তির আবির্ভাব ঘটাইয়াছিল। সর্বাতিশায়িনী তিনিই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা। তাই ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন শক্তিও একত্র হইয়াছে তাঁহার সত্তায়।

তাঁহার 'জটাজূটসমাযুক্তাম্' ইত্যাদি যে-ধ্যানমন্ত্র রহিয়াছে, তাহাতে সমস্ত ঐশ্বর্যের আধার বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছি আমরা। মনে হয় সুরথ রাজা এবং ধনিক সমাধি বৈশ্য তাঁহার এই মূর্তিরই পূজা করিয়া দেবীর পূজার প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে-ঐশ্বর্য ওই মূর্তির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তাহাকেই ব্যক্ত করিয়া সকলের নয়নসম্মুখে ধরিবার জন্য 'কালীবিলাসতন্ত্র' এক-একটি ঐশ্বর্যের অধিপতিকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাঁহার দুই পাশে। বলিয়াছেন : 'বামে চ কার্তিকং দেবং দক্ষিণে গণপং তথা'—দেবীর বাঁদিকে কার্তিক এবং ডানদিকে গণেশের পূজা করিবে। ''যা নিত্যা প্রকৃতির্লক্ষ্মীর্দুর্গায়া দক্ষিণে স্থিতা।/ শারদা ভারতী নিত্যং বামভাগে সদা স্থিতা॥''—দেবীর ডানদিকে লক্ষ্মী এবং বাঁদিকে সরস্বতী নিত্য বিরাজ করিতেছেন।

বলিয়াছি—সর্বাতিশায়িনী মূর্তি। অন্যে পরে কা কথা, 'ভবিষ্যোত্তরপুরাণ' বলিতেছেন : 'এবং নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যন্তে সর্বদস্যুভিঃ' অর্থাৎ ম্লেচ্ছ বলি যাহাদের, নাই আচার, নাই বিচার কিংবা দস্যু যাহারা, পরকে মারিয়া ধরিয়া, টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া জীবন চালায়, তাহারাও দেবীর পূজা করে। 'বিনা মন্ত্রৈঃ'—মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই, 'জপযজ্ঞৈর্বিনা'—জপ নাই, যজ্ঞ নাই, 'সুরামাংসাদ্যুপহারৈঃ'—মদ, মাংস হয় সেই পূজার উপচার। এমনকি যে-মহিষাসুরকে বধ করিয়াছেন দেবী, তাঁহারও 'মহিষস্ত্বং মহাবীর'—'হে মহিষ, তুমি মস্ত বীর' ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা রহিয়াছে।

দেবীর মহিমার বিপুলত্বই দেবীর পূজাকে ব্যাপকত্ব দিয়াছে। বোধন, আমন্ত্রণ, অধিবাস, মহাস্নান, নবপত্রিকাস্থাপন—চলতি কথায় 'কলাবউ' নাম হইয়াছে, দেবীর আরাধনার এই বিবিধ বিধি।

কালিকাপুরাণ বলিয়াছেন, ''বোধয়েদ্ বিল্বশাখায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং ফলেষু চ।/ সপ্তম্যাং বিল্বশাখাং তাম্ আহৃত্য প্রতিপূজয়েৎ।/ পুনঃ পূজাং তথাষ্টম্যাং বিশেষেণ সমাচরেৎ।/ প্রভূতবলিদানং চ নবম্যাং বিধিবচ্চরেৎ।/ বিসর্জনং দশম্যাং তু কুর্যাদ্ বৈ শাবরোৎসবৈঃ''—ষষ্ঠীতে বেলের ডালে এবং ফলে অর্থাৎ ওই শাখায় যে-বেলফল থাকিবে, তাহাতে দেবীর 'বোধন' অর্থাৎ পূজাপূর্বক জাগরণ ঘটাইবে কারণ প্রতিবৎসরই পূজার এই সময়টাতে দেবকুল সুপ্ত থাকেন।

শ্রাবণমাস হইতে পৌষমাস পর্যন্ত সূর্যের 'দক্ষিণায়ণ'। এইসময় সূর্য ক্রমশ দক্ষিণদিকে সরিয়া যান। এই সময়টা দেবতাদের পক্ষে রাত্রিকাল বলিয়া তাঁহারা নিদ্রিত থাকেন। সুতরাং শরৎকালে আশ্বিন-কার্তিক মাসে দক্ষিণায়ণ চলিতে থাকায় দেবী দুর্গা নিদ্রিতা। তাঁহার পক্ষে এই সময়টা 'অকাল'। এই অকালে তাঁহার পূজা করিতে হইলে তাঁহাকে জাগাইতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার বোধন বা জাগরণ ঘটাইতে হইবে। পূজা আরম্ভ হইবে সপ্তমী হইতে, এইজন্য তাহার আগের দিন সন্ধ্যায় তাঁহার 'বোধন' বা জাগরণ ঘটাইতে হয়।

'বাসন্তীপূজা' অবিকল দুর্গাপূজা কিন্তু তাহা সাধারণত বসন্তকালে চৈত্রমাসে হয়। তখন উত্তরায়ণ বলিয়া দেবতারা জাগ্রত। তাই বাসন্তীপূজায় দেবী দুর্গার বোধন নাই।

সপ্তমীতে ওই ফলযুক্ত শাখাকে কাটিয়া নবপত্রিকায় যুক্ত করিয়া আবার পূজা করিতে হইবে। অষ্টমীতে বিশেষভাবে পুনশ্চ পূজার বিধি। নবমীতে প্রভূত সামগ্রী দিয়া আর একবার দেবীর পূজা হইবে এবং দশমীতে সংক্ষিপ্ত পূজার পর ব্যাধজাতির আদবকায়দায় 'ধূলিকর্দমবিক্ষেপৈঃ'—ধূলাকাদা ছড়াইয়া ছিটাইয়া, ঢোলক বাজাইয়া, শিঙা ফুঁকিয়া জলে বিসর্জন দিতে হইবে।

আমাদের জীবনে এতদিনের জন্য এত উপকরণ দিয়া আর কোন দেবতার পূজা আছে? মহাস্নানের উপকরণবৈচিত্র্য দেখিবার মতো। এক মাটিতেই তাহার উপলব্ধি হয়, যেখানে শাস্ত্র বলিতেছেন—মাটি লাগিবে 'দশবিধ'—দশ রকমের। তাহার মধ্যে যেমন আছে গঙ্গামাটি, তেমনি আছে শূকরের দাঁতের মাটি, রাজ-দুয়ারের মাটি, বেশ্যার ঘরের দরজার মাটি। দুর্গাপূজার সার্বজনীনতার ঢক্কানিনাদ শুনিতে পাই এই বিধিতে।

'পূজা' শব্দটি একেবারেই সাধারণ। 'পঙ্কজ' বলিলে যেমন পাঁকে জন্ম হইয়াছে এমন শ্যাওলা, শামুক, গুগলি, হিঞ্চে, কলমিকে বাদ দিয়া শুধু পদ্মকেই বোঝায়, 'পূজা' শব্দটির অর্থ তেমন সীমিত নয়। তাহা লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, কালী, শিব, নারায়ণ—যেকোনও দেবতারই অর্চনা বোঝায়। তবু বাংলা ভাষায় এটির যোগরূঢ় 'পঙ্কজ' শব্দের মতোই 'দুর্গাপূজা' সম্বন্ধে ব্যবহার চলে। 'পূজা এল' বলিলে অভ্রান্তভাবে আমরা বুঝি 'দুর্গাপূজা' আসন্ন। সরস্বতী বা লক্ষ্মী কিংবা কালীপূজায় আমরা যাহার যেমন শক্তি সেইমতো আয়োজন করি, তথাপি শুধু 'পূজা' শব্দের দ্বারা ইহাদের কোনওটিকেই নির্দেশ করি না। 'পুজোর জামা', 'পুজোর কাপড়', 'পুজোর ছুটি', 'পুজোর বাজার', কোনও কাগজের ' পূজাসংখ্যা'—এসব তো আছেই, রেলগাড়ির নামও শুনিয়াছি 'পূজা স্পেশাল'।

এতাবতা এইটি বক্তব্য হইল যে দুর্গাপূজা অনেক বড়ো ব্যাপার। শুধু পূজা নয়, এটি 'উৎসব' আমাদের জীবনে। আমরা খুব আনন্দ করি সরস্বতীপূজায়, লক্ষ্মীপূজায়, কালীপূজায় কিন্তু আমাদের ভাষায় যেমন আছে 'দুর্গোৎসব' তেমন তো নাই 'সরস্বতী উৎসব', 'লক্ষ্মী উৎসব', 'কালী উৎসব'—এইসব প্রয়োগ। স্বয়ং রঘুনন্দন তাঁহার 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' গ্রন্থের দুর্গাপূজার অধ্যায়ে বলিয়াছেন, 'দুর্গোৎসব'। অন্য দেবদেবীর প্রতিমা আমরা ভাসান দিই ভক্তিভরে—দেবী দুর্গার প্রতিমা যখন বেদি ছাড়িয়া বিসর্জনের পথে যাত্রা করে তখন বঙ্গজননী আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে বলেন : 'আবার এসো মা।'

বস্তুত পুরোহিত যখন 'ক্ষমস্ব' বলিয়া ঘট এবং প্রতিমা নাড়িয়া দেন, তাহার পূর্বে তিনিই স্বয়ং হাত জোড় করিয়া মন্ত্রপাঠ করেন : ''গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি।/ সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥''—হে পরমেশ্বরী, তুমি তোমার আপন স্বর্গীয় আবাসে গমন করো। শর্ত রহিল, বছর কাটিলে তুমি আবার আসিবে।

দুর্গাপূজায় বঙ্গজননী মা মেনকা হইয়া যান এবং উমা অর্থাৎ দুর্গা হন তাঁহার কন্যা। ঋতুর পরে ঋতু যায়, এই জননীর আর সয় না প্রতীক্ষা; বলেন—'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী।' মধ্যরাতে ঘুম ভাঙিয়া যায়, পতিকে ঈষৎ ঠেলা দিয়া বলেন : 'কুস্বপন দেখেছি গিরি... দ্বিভুজা আছিল উমা, দশভুজা কেন হল?' তারপরেই তাঁহার কোমরবাঁধা সংকল্প : 'এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না।'

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' অন্নপূর্ণা যখন ঈশ্বরী

পাটনির নায়ে পা দিলেন, তখন নৌকার পাটাতন সোনা হইল। পাটনি হাঁ করিয়া ভাবিল—'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।' পাটনির কাছে গোড়ায় যিনি মানুষ ছিলেন, পরে তিনি হইলেন দেবতা। বঙ্গজননী আগে হইতে যাঁহাকে জানেন দেবতা বলিয়া তাঁহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন কন্যারূপে। তিনিই ধন্যা।

দেখিতেছি—কেতকীতে জল জমিয়াছে। শিউলি যেন আগাম অঞ্জলি উৎসর্গ করিতেছে জননীর পায়ে। ঘাসের শিষে শিশিরবিন্দু ভোরের আলোয় রামধনু ধরিয়াছে। বাতাস যেন চামর দোলাইতেছে। আলতো আলতো তাহার ছোঁয়া। আকাশের নীল ঘনতর। তাহার গায়ে গায়ে বকের পাঁতি দিগন্ত হইতে দিগন্তে চলিয়াছে। তাহাদের কণ্ঠের কাকলি পশিতেছে কানে। বৃহতের একটা প্রতীক্ষা জাগিতেছে মনে। আকাশে মেঘ নাই। তথাপি তাহাতে গুরু গুরু গম্ভীর মৃদঙ্গের তালে রব উঠিয়াছে—'এহ্যেহি ভগবত্যম্ব!'—'এসো, এসো, ভগবতী জননী!' ওই ডাক আমাদেরও অন্তরের। হে জননী, মন দিয়া প্রাণের কথা শোনো। তুমি সকলেরই মা। দেখিতেছ—কত নিরন্ন চারিদিকে। কত পীড়িত বিনা ঔষধে বিনিদ্র রাত যাপন করে। কত জননীর কত সন্তান অকালে মায়ের কোল শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। কত সৎ মানুষ বিক্রান্ত অত্যাচারীর কবলে দুঃখ পায়। কত উদ্ধত শক্তি আত্মবিস্মৃত হইয়া আপন কল্যাণের পথ আপনিই রুদ্ধ করিয়া দেয়, জানিয়া শুনিয়া লোভের বশে কত অন্যায় করে। জানি 'স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো হি জন্তুঃ'—প্রাণী আপন কর্মের ফলের সঙ্গে বাঁধা। তবু অন্যায় করিয়া যদি মায়ের কাছে দাঁড়ায়, তিনি সন্তানের অসমর্থনীয় কর্মের অশুভ ফল হইতে সন্তানকে দূরে রাখিতে সব শক্তি প্রয়োগ করেন। তুমি তো বিশ্বমাতা, সব সন্তানের জননী। শুধু তাহাই নহে, অনন্তশক্তির আধার। যে-দুঃখের তালিকা তোমার চরণে পেশ করিলাম, তোমার সন্তানদের তাহার আবেশ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের জীবন ধর্মে এবং কর্মে উজ্জ্বল করো। যদি মহিষাসুরকে বধ করিয়াছ তবে অক্ষম সন্তানদের অন্তরের ছয়টি রিপুকেও লুপ্ত করিয়া দাও।

জননীর রক্তকমলের মতো চরণ দুইটির উপরে ললাট রাখিয়া বলিতেছি : 'প্রসাদং কুরু মে দেবি, দুর্গে দেবি নমোহস্তু তে।'—কৃপা করো দেবী, অয়ি দেবী দুর্গা, তোমায় প্রণাম।